আলিয়া ইজেতবেগভিচ
ও
বসনিয়া

নূরুল হুদা হাবীব

গার্ডিয়ান
পা বলি কে শ ন স

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

জন্ম ও প্রাথমিক জীবন

- সার্বিয়া থেকে বসনিয়ায় আলিয়ার পূর্বপুরুষ ১৭
- আলিয়ার পরিবার ১৮
- আলিয়ার জন্ম ১৯
- সারায়েভোতে আলিয়ার পরিবার ২০
- আলিয়ার প্রাথমিক শিক্ষা ২০
- আলিয়ার বেড়ে ওঠার দিনগুলো ২১
- হাইস্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আলিয়া ২৩
- কমিউনিস্ট প্রচারণা ও আলিয়া ২৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

সংগ্রাম, কারাভোগ ও বিয়ে

- ‘ইয়াং মুসলিম’ গঠন ও আলিয়া ২৮
- সেনাবাহিনীতে যোগ না দিয়ে পলাতক আলিয়া ৩২
- যুগোস্লাভিয়া গঠন ৩৩
- আলিয়ার প্রথম কারাবরণ ৩৪
- কারাগারের স্মৃতিময় দিনগুলো ৩৮
- আলিয়া ইজেতবেগভিচের বিয়ে ৪০
- আলিয়ার চাকরি ৪১

তৃতীয় অধ্যায়

যুগোস্লাভিয়ার ভাঙন, বসনিয়ার স্বাধীনতা ও সারায়েভো ট্রায়াল

- টিটোর শাসনামলে যুগোস্লাভিয়ার মুসলিম ৪৩
- বসনীয় মুসলিমদের পুনর্জাগরণ ৪৫
- বসনিয়ার ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ৪৭
- দ্বিতীয়বার গ্রেফতার আলিয়া ৫১
- ইসলামিক ডিক্লারেশন ও সারায়েভো ট্রায়াল ৫৪
- রায় ঘোষণা ৬০
- কারাগারে আলিয়া ৬৪

◈ টিটোর মৃত্যু ও যুগোস্লাভিয়ার ভাঙন ৭০
◈ আলিয়া ইজেতবেগভিচ কর্তৃক রাজনৈতিক দল গঠন ৭৪
◈ নির্বাচনে জয়লাভ ৮৩
◈ বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রীয় সফরে আলিয়া ৮৫
◈ বসনিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা ৮৭

চতুর্থ অধ্যায়

যুদ্ধের বিভীষিকা ও আলিয়া ইজেতবেগভিচ

◈ যুদ্ধের শুরু যেভাবে ৯৩
◈ বসনীয়দের জাতিগত পরিচিতি ও যুদ্ধের কারণ ৯৬
◈ কন্যা সাবিনাসহ সার্ব সেনাবাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ আলিয়া ১০১
◈ বিমানবন্দর থেকে লুকাভিচা সেনাঘাঁটিতে ১০৪
◈ বসনীয় মুসলিমদের যুদ্ধ প্রস্তুতি ১০৬
◈ জাতিসংঘ কর্তৃক অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা ১০৮
◈ ওআইসির বিশেষ সম্মেলনে আলিয়া ১১০
◈ অকথ্য নির্যাতন ও নারকীয় হত্যাযজ্ঞ ১১৩
◈ ধর্ষণের বীভৎসতা ১১৭
◈ ধর্ষণের ফলে জন্ম নেওয়া শিশু ১২৪
◈ শুধু নারী নয়; পুরুষ ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতন ১২৬
◈ যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি ও ঘটনাপ্রবাহ ১২৭
◈ স্রেব্রেনিৎসা গণহত্যা ও বিশ্ব সম্প্রদায়ের ব্যর্থতা ১২৯
◈ বসনিয়ায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর দুঃসাহসিক ভূমিকা ১৩৪

পঞ্চম অধ্যায়

অবশেষে শান্তি

◈ ভ্যান্স-ওয়েন পিস প্ল্যান ১৪০
◈ ডেটন শান্তিচুক্তি ও বসনিয়া সংকটের সমাধান ১৪২
◈ ডেটন চুক্তি কী প্রকৃতপক্ষে শান্তিচুক্তি ১৪৭
◈ বসনিয়া সংকট ও মুসলিম বিশ্ব ১৪৮

ষষ্ঠ অধ্যায়

বসনিয়া সংকটে কতিপয় আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বের ভূমিকা

◈ সিনেটে প্রতিবাদমুখর জো বাইডেন ১৫১
◈ বিল ক্লিনটন ১৫৫
◈ নাজমুদ্দিন এরবাকান ১৫৬

◈ মাহাথির মুহাম্মাদ	১৫৭
◈ ইয়াসির আরাফাত	১৬০
◈ মুহাম্মাদ আলি ক্লে	১৬১
◈ বেনজির ভুট্টো	১৬৪
◈ আয়িশা গাদ্দাফি	১৬৪

সপ্তম অধ্যায়

যুদ্ধপরবর্তী আলিয়া ও তাঁর শেষ জীবন

◈ প্রেসিডেন্ট পদ থেকে আলিয়ার অবসর গ্রহণ	১৬৫
◈ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আলিয়ার ঐতিহাসিক ভাষণ	১৬৬
◈ আলিয়া ইজেতবেগভিচের মৃত্যুশয্যায় এরদোয়ান	১৭৫
◈ আলিয়া ইজেতবেগভিচের ইন্তেকাল	১৭৭
◈ আলিয়া ইজেতবেগভিচের জানাজা	১৮০
◈ আলিয়া ইজেতবেগভিচের সন্তানাদি	১৮৩
◈ লায়লা আকশামিয়া	১৮৩
◈ সাবিনা বেরবেরোভিচ	১৮৪
◈ বাকির ইজেতবেগভিচ	১৮৪
◈ সন্তানদের চোখে আলিয়া	১৮৫
◈ আলিয়ার পুরস্কার ও সম্মাননা	১৮৬
◈ সৌদি আরব কর্তৃক সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি	১৮৬
◈ তুরস্ক কর্তৃক সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি	১৮৭

অষ্টম অধ্যায়

আলিয়ার বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক সত্তা

◈ আলিয়া ইজেতবেগভিচের বুদ্ধিবৃত্তিক সত্তা	১৮৮
◈ আলিয়ার রাষ্ট্রচিন্তা	২০৭
◈ আলিয়ার কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ উক্তি	২০৯
◈ আলিয়ার রাজনৈতিক সত্তা	২১০

নবম অধ্যায়

বসনিয়া-হার্জেগোভিনার পরিচিতি

◈ বসনিয়ার ইতিহাসের পরিক্রমা	২১৬
◈ নাম ও ভৌগোলিক অবস্থান	২১৮
◈ ভাষা	২১৯
◈ জনসংখ্যা	২১৯

◈ প্রাচীনকালে বসনিয়া ২২০
◈ মধ্যযুগে বসনিয়া ২২২
◈ বসনিয়ায় অটোম্যানদের আগমন ২২৩
◈ অটোম্যান আমলে বসনিয়া ২২৬
◈ অটোম্যান পরবর্তী বসনিয়া ২৩০
◈ ফিলিস্তিনে বসনীয় মুসলিম কমিউনিটি ২৩২
◈ প্রশাসনিক কাঠামো ২৩৩
◈ বসনিয়ার রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল ২৩৪
◈ শিক্ষাব্যবস্থা ২৩৭
◈ অর্থনীতি ২৩৯
◈ সংস্কৃতি ২৪১
◈ কতিপয় বসনীয় প্রবাদ-প্রবচন ২৪৭
◈ বসনিয়ার ইসলামিক কমিউনিটির পরিচিতি ২৪৭
◈ যুদ্ধের পূর্বাপর বসনিয়া ২৫০
◈ মুসলিম বিশ্ব ও বসনিয়া ২৫১
◈ বসনিয়ায় অন্যান্য মতবাদের প্রভাব ও তাদের কার্যক্রম ২৫৩

প্রথম অধ্যায়

জন্ম ও প্রাথমিক জীবন

সার্বিয়া থেকে বসনিয়ায় আলিয়ার পূর্বপুরুষ

অটোম্যান সাম্রাজ্যের তখন পড়ন্ত বিকেল।

কয়েক শ বছরব্যাপী দোর্দণ্ড প্রতাপের সাথে দুনিয়ার তিন তিনটি মহাদেশ শাসনকারী অটোম্যান শৌর্য-বীর্য হারিয়ে তখন ক্রমান্বয়ে সূর্যাস্তের পথে। অটোম্যানদের এ অনিবার্য পরিণতির অংশ হিসেবে ১৮৭৮ সালে বার্লিন চুক্তির মাধ্যমে তাদের বসনিয়ার কর্তৃত্ব ছেড়ে দিতে হয় অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের কাছে। নাম থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়, অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় হচ্ছে অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরি অঞ্চলের রাজবংশের সম্মিলিত একটি সাম্রাজ্য। কয়েক শ বছর ধরে এ অঞ্চলকে শাসন করার পর বসনিয়ার কর্তৃত্ব হাতছাড়া হওয়াটা অটোম্যানদের জন্য ছিল অবমাননাকর। কিন্তু ততদিনে আর তেমন কিছুই করার ছিল না। সার্বিয়ায় অটোম্যানদের কর্তৃত্ব খর্ব হওয়ার পর সার্বিয়ার মুসলিমদের সেখান থেকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ করা হয়। ফলে অসংখ্য মুসলিম পরিবার নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে আশেপাশের অঞ্চলসমূহে পাড়ি জমায়। শুধু সার্বিয়া নয়, অটোম্যান শাসিত বলকান অঞ্চলের মুসলিমদের জন্যই এটি ছিল একটি স্বাভাবিক পরিণতি।

এই হিজরতকারী পরিবারগুলোর মধ্যে একটি ছিল ইজেতবেগভিচ পরিবার। পরিবারটি সে সময় সার্বিয়ার বেলগ্রেড থেকে বসনিয়ার বোসান্সকি শামাচ নামক এলাকায় এসে বসতি স্থাপন করে। বসনিয়ার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বসনিয়ার সবচেয়ে বড়ো দুটো নদী সাভা ও বোসনা নদীঘেরা সদ্যজাত শিশুর মতো সদ্য গঠিত সামাচ শহরটি তখনও ততটা উন্নত-পরিপুষ্ট হয়ে ওঠেনি। অটোম্যান সুলতান দ্বিতীয় আবদুল আজিজ অটোম্যানদের আরেক প্রদেশ Smerdrevo থেকে আগত মুসলিমদের আশ্রয়ের জন্য ছোট্ট এই ভূখণ্ডটি বরাদ্দ করেছিলেন। আগত মুসলিমরাই মূলত ১৮৬২ সালে শহরটির গোড়াপত্তন করেন। ১৯০৮ সালে অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আগপর্যন্ত এটি অটোম্যান সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। ইজেতবেগভিচ পরিবার শহরটিতে কয়েক দশক বসবাস করে। সামাচে আসার কিছুদিন পর আলিয়া ইজেতবেগভিচের দাদা শামাচের মেয়র নির্বাচিত হন।

আলিয়ার পরিবার

অটোম্যান আমলে পরিবারটির ছিল বংশপরম্পরায় বিরাট ব্যাবসা ও বিপুল অর্থসম্পদ। সেইসাথে বংশগতভাবেই পরিবারে ছিল সৈনিকের ধারা। আলিয়ার দাদার নামও ছিল আলিয়া ইজেতবেগভিচ। দাদা আলিয়া ইস্তাম্বুলে অটোম্যান সেনাবাহিনীর অসম সাহসী লড়াকু সৈনিক

ছিলেন। ইস্তাম্বুলে থাকাবস্থায় ইস্তাম্বুলের উস্কুদার অঞ্চলের ‘সাদিকা’ নামের এক সম্ভ্রান্ত বংশের তুর্কি রমণীর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন আলিয়ার দাদা। সেদিক থেকে আলিয়ার শরীরে বইছিল তুর্কি রক্তের ধারা। দাদার মতো বাবা মুস্তাফা ইজেতবেগভিচও ছিলেন সাহসী সৈনিক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইতালির পক্ষে লড়তে গিয়ে মারাত্মকভাবে আহত হন। এত বেশি আহত হয়েছিলেন যে, শরীরের একাংশ প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হয়ে প্রায় অকেজো হয়ে গিয়েছিল। নিজের কাজগুলোও নিজে করতে পারতেন না। মৃত্যু অবধি জীবনের শেষ দশ বছর তাকে প্রায় বিছানায় কাটাতে হয়েছিল। আলিয়ার মা হিবা ইজেতবেগভিচ অত্যন্ত বিদুষী মহিলা ছিলেন। সন্তানদের দেখাশোনার পাশাপাশি বিছানাগত স্বামীকে দেখভাল করতে হতো। তিনি ছিলেন ধৈর্যের এক অনুপম দৃষ্টান্ত। অসুস্থ স্বামীর দেখভাল, সন্তানাদি পালন ও সংসারের যাবতীয় কর্মকাণ্ড এক হাতে করতে তিনি বিন্দুমাত্র ক্লান্ত হতেন না। মাঝে মাঝে আলিয়া ও তার বোনেরা বাবাকে ছোটোখাটো কাজে সাধ্যমতো সাহায্য করত। ১৯২১ সালে আলিয়ার বাবার প্রথম স্ত্রী মারা যান। তারপর তিনি আলিয়ার মাকে বিবাহ করেন। আলিয়ার মায়ের গর্ভের পাঁচ ভাই-বোন আর সৎ-মায়ের গর্ভের দুই ভাই মিলে বেশ বড়োসড়ো একটি পরিবার ছিল তাদের।

পরিবারের সাথে শিশু আলিয়া

আলিয়ার জন্ম

আলিয়ার পরিবার শামাচে আসার কয়েক বছর পরেই শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির কয়েক বছর পর সার্বিয়া থেকে হিজরতকারী এই পরিবারেই পর পর দুই মেয়ের জন্মের পর ১৯২৫ সালের ৮ আগস্ট, শনিবার মুস্তাফা ইজেতবেগভিচ ও হিবা ইজেতবেগভিচ দম্পত্তির কোল আলোকিত করে ভূমিষ্ঠ হয় এক ফুটফুটে পুত্র সন্তান। এই সন্তানটি আর কেউ নয়, তিনিই হলেন প্রখ্যাত আইনজ্ঞ, দার্শনিক, বসনিয়ার স্বাধীনতার আলোকবর্তিকা ও দেশটির প্রথম প্রেসিডেন্ট, জ্ঞানসম্রাট আলিয়া ইজেতবেগভিচ। দৈহিক আকৃতির দিক থেকে আলিয়া দেখতে ছিলেন তার মা আর মামাদের মতো, কিন্তু আচার-আচরণ ও চারিত্রিক দৃঢ়তায় তিনি ছিলেন বাবার মতো। অসম সাহসী বাবা আর দাদার সাহস ও দৃঢ়তা ছিল তার পারিবারিক

উত্তরাধিকার। কিন্তু আলিয়া আক্ষেপ করতেন, তিনি যদি বাবার মতো হতেন! তার বাবা মুস্তাফা ছিলেন সুদর্শন ও সৈনিকসুলভ শারীরিক গঠনের এক নয়ন জুড়ানো সুপুরুষ।

সারায়েভোতে আলিয়ার পরিবার

১৯২৮ সাল। আলিয়ার বয়স তখন তিন বছরও পূর্ণ হয়নি। নিজের অসুস্থতা, ব্যবসায় মন্দা, অর্থনৈতিক অনটন সব মিলিয়ে সংসার খুব একটা ভালো যাচ্ছিল না দেখে মুস্তাফা ইজ্জেতবেগভিচ সপরিবারে রাজধানী সারায়েভোতে চলে গেলেন। পরিবারের সকলের হাসি-আনন্দের উৎস আলিয়া। বড়ো বোন দুজন আলিয়াকে নিয়ে খেলে, আদর করে। সারায়েভোর আলো-বাতাসে গুটিগুটি পায়ে এভাবেই বেড়ে উঠতে থাকে আলিয়া।

যদিও আলিয়ার বাবা তার মামা তথা মায়ের পক্ষের আত্মীয়দের সহায়তায় তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় থাকতেন, তথাপি তাকে সকলেই শ্রদ্ধা ও সমীহ করত। আলিয়ার মামাদের পরিবারের বিয়েশাদি-সংক্রান্ত বা পারিবারিক ছোটোখাটো ঝামেলাগুলো তার বাবাই সমাধান করতেন। বলা যায় আলিয়ার মাতৃপক্ষীয় আত্মীয়স্বজন আলিয়ার বাবাকে একপ্রকার অভিভাবক ও বিচারক হিসেবেও মানত। শিশু আলিয়া মাকে একটু বেশিই ভালোবাসত। আলিয়া তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন—'মা যখন বাবার সাথে বাইরে কোথাও ঘুরতে যেত, বাসায় না ফেরা পর্যন্ত আমি ঘুমোতে পারতাম না। কখনো কখনো মায়ের ফিরতে প্রায় মধ্যরাত হয়ে যেত। তবুও মধ্যরাত অবধি আমি মায়ের ফেরার অপেক্ষায় থাকতাম—কখন মায়ের পায়ের শব্দ শুনব। মা-বাবার দরজা খোলার শব্দ শুনে তাদের দেখে তবেই ঘুমাতাম।'[১]

আলিয়ার প্রাথমিক শিক্ষা

হাটি হাটি পা পা করে আলিয়ার বয়স যখন সাড়ে পাঁচ বছর, তার মা সিদ্ধান্ত নিলেন মক্তবে ভর্তি করবেন। বসনিয়ার মক্তবগুলো অটোম্যান আমল থেকে চলে আসা ইসলামি শিক্ষার দীর্ঘ ঐতিহাসিক পরম্পরার অংশ। ভোরবেলায় স্থানীয় মসজিদে বাচ্চাদের কুরআন শেখার জন্য মক্তবের এ ধারা আবহমানকাল ধরে বাংলাদেশের সমাজেরও গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যদিও সেগুলো এখন ক্রমহ্রাসমান! বসনীয় ভাষায় মক্তবকে বলা হয় মেকতেব (Mekteb)। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মা হিবা আলিয়াকে মক্তবে ভর্তি করালেন। ছয় মাস যেতে না যেতেই শিশু আলিয়া কুরআন পড়া শিখে ফেলল। তাই দেখে বাবা মুস্তাফার আনন্দ যেন আর ধরে না! বন্ধুদের কাছে গর্ব করে বলেন—'জানো, আমার ছেলে কুরআন পড়া শিখে ফেলেছে!' আলিয়া কুরআন পড়া শিখেছে জেনে তার বাবার এক বন্ধু আলিয়ার জন্য ছোট্ট একটি কাঠের ডেস্ক বানিয়ে দেন। যেন বন্ধুপুত্র আলিয়া এর ওপর বই রেখে পড়তে, লিখতে ও বাড়ির কাজ করতে পারে। পরিবার ছেড়ে অন্যত্র যাওয়ার আগপর্যন্ত আলিয়া তার বাবার বন্ধুর দেওয়া ওই ডেস্কেই পড়াশোনা করতেন। সাড়ে ছয় বছর বয়সে শিশু আলিয়া মক্তবের নির্ধারিত পাঠ শেষ করলে মা তাকে প্রাথমিক

---

[১] Alija Izetbegović, Inescapable Questions: Autobiographical Notes, translated by Saba Rissaluddlin and Jasmina Izetbegovic (Leicester: The Islamic Foundation, 2003) P. 13

বিদ্যালয়ে (Elementary School) ভর্তি করে দিলেন। আলিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাদের শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন, তারা অধিকাংশই ছিলেন সার্ব। অল্প সময়ের জন্য মুহিচ নামের কেবল একজন মুসলিম শিক্ষককে পেয়েছিলেন। আলিয়ার বয়স তখন নয় বছর। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চতুর্থ গ্রেডে (শ্রেণি) পড়েন। হঠাৎ অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের শাসক কিং আলেক্সান্ডার আততায়ীদের হাতে নিহত হয়। গোটা সাম্রাজ্যজুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। প্রতিটি বাড়িতে কালো পতাকা টাঙানো হয়। আলিয়াদের বাড়িও তার ব্যতিক্রম ছিল না। আলিয়া বলেছেন—'প্রায় ছয় মাস যাবৎ শহরজুড়ে এত কালো পতাকা টাঙিয়ে রাখা হয় যে, গোটা শহরকে মনে হতো যেন একটি কাক।'

আলিয়ার বেড়ে ওঠার দিনগুলো

ওইটুকু বয়সে অত সকলাবেলায় ঘুম থেকে উঠতে কার মন চায়! আলিয়ারও উঠতে মন চাইত না। তবুও মা তাকে ভোরবেলায় ঘুম থেকে জাগিয়ে দিতেন। খুব ভোরে মা আগে ওঠে আলিয়াকে জাগিয়ে ফজরের নামাজের জন্য মসজিদে পাঠাতেন। বর্তমানের বসনীয় সমাজ স্বচক্ষে দেখে সহজেই অনুমান করা যায়, অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় শাসনের ওই কঠিন সময়ে একজন বালককে ঘুম থেকে জাগিয়ে মসজিদে পাঠানো কতটা ধর্মভীরুতার পরিচায়ক। কতটা পরহেজগার হলে তখনকার বৈরী সমাজেও সন্তানকে ইসলাম চর্চায় অভ্যস্ত করতে ফজরে মসজিদে পাঠানো যায়। ফজরের নামাজকে স্থানীয় ভাষায় বলা হয় 'সাবাহ'। সাবাহ শব্দটি মূলত আরবি, এর বাংলা অর্থ ভোর, সকাল, প্রত্যুষ। ফজরের নামাজ ভোরবেলায় পড়া হয় বলে একে সাবাহ বলে। আলিয়াদের বাসা তখন সারায়েভো শহরের প্রাণকেন্দ্রে টাউন হলের বিপরীতে হাজিসকা মসজিদের পাশে। সারায়েভো শহরের বুক চিরে কুল কুল রবে সাপের মতো আঁকাবাঁকা হয়ে বয়ে যাওয়া খালের মতো সরু নদীর পাড়ে মসজিদটি অবস্থিত। এই হাজিসকা মসজিদেই নিয়মিত ফজর পড়তেন আলিয়া।

লেখকের ক্যামেরায় হাজিসকা মসজিদ

মসজিদের ইমাম ছিলেন মুয়েজিনোভিচ নামের এক বয়স্ক ব্যক্তি। স্থানীয় সকলের নিকট অত্যন্ত সম্মানিত ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন ইমাম মুয়েজিনোভিচ। ইমাম সাহেব ফজরের নামাজে সাধারণত সূরা আর-রহমানের দ্বিতীয় রুকু তিলাওয়াত করতেন। মসজিদের চারদিকে ফুটন্ত ফুলের মনমাতানো সৌরভে, ইমামের সুমধুর কণ্ঠে কাব্যময় সূরা আর-রহমানের অনুপম তিলাওয়াতে, বসন্তের প্রত্যুষের মৃদু সমীরণে বালক আলিয়া এক অনির্বচনীয় মুগ্ধতা খুঁজে পেত। এক অন্যরকম ভালো লাগার পরশ ছুঁয়ে যেত তার কচি হৃদয়ে; যেটি তিনি জীবনের শেষ অবধি অনুভব করেছেন।

আলিয়ার মা তার বাবার পরিবার থেকে সম্পত্তির একটা অংশ পেয়েছিলেন। গ্রীষ্মের ছুটিতে আলিয়ার পরিবার বসনিয়ার আজিচি শহরে বেড়াতে যেত। শহরটি রাজধানী সারায়েভো থেকে খুব একটা দূরে নয়। ১৯৩২ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যবর্তী এই ৭-৮ বছরে প্রতিবছরই গ্রীষ্মের স্কুল ছুটিতে গ্রামের সে বাড়িতে যেত। আলিয়ার বাবা বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ার আগপর্যন্ত বাবা-মাসহ সবাইকে নিয়েই যেত। বাবা অসুস্থ হওয়ার পর বিধবা খালার সাথে আলিয়ারা সব ভাই-বোন মিলে আজিচি যেত। বাল্যকালের সে সোনাঝরা দিনগুলো আলিয়ার জীবনের নিঃসন্দেহে অবিস্মরণীয় সময়।

হাইস্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আলিয়া

প্রাইমারি স্কুল শেষ হলে আলিয়া হাইস্কুলে ভর্তি হলেন। আলিয়ার স্কুলের নাম ছিল 'ফার্স্ট বয়েজ জিমনেসিয়াম স্কুল'। স্কুলটি সারায়েভো শহরের নামকরা স্কুলগুলোর একটি। এখান থেকে পাশ করা শিক্ষার্থীরা সেরা ছাত্র বলে বিবেচিত হতো। না, এটি শরীরচর্চার জিমনেসিয়াম নয়; বরং স্কুলের পঠন-পাঠন পদ্ধতির একটি বিশেষ অ্যাকাডেমিক ধারা। এখানে সাধারণত কয়েক বছর পড়তে হয়, এক একটি বছরকে এক একটি গ্রেড বলা হয়। খুব ভালোও নয় আবার খারাপও নয়; বরং আলিয়া ছিলেন মধ্যম মানের শিক্ষার্থী। খুব মনোযোগ দিয়ে কিছুক্ষণ পড়ে তারপর বইপত্র দূরে সরিয়ে রাখতেন তিনি। একবার তাকে জিমনেসিয়াম স্কুলের চতুর্থ গ্রেডের চূড়ান্ত পরীক্ষায় বসার সুযোগ দেওয়া হয়নি আগের গ্রেডে ইতিহাস বিষয়ে কম নম্বর পাওয়ার কারণে; যদিও ইতিহাস তার পছন্দের বিষয় ছিল। আলিয়া তার ভাষায় বলেছেন—'আমি ইতিহাসে কম নম্বর পাওয়ার জন্য ইতিহাসের শিক্ষককেই দায়ী করলাম। তিনি ছিলেন সার্বিয়া থেকে আসা সার্ব, দৈহিকভাবে বেশ লম্বা গড়নের। পূর্বাঞ্চলীয় কথ্যভাষায় কথা বলতেন, মাঝে মাঝে মুসলিম ছাত্রদের ঠাট্টা করতেন। আমার মনে হয়েছে কম নম্বর পাওয়ার জন্য তাকে দায়ী করাটা আমার যথোপযুক্ত ছিল।'

১৮-১৯ বছর বয়সেই আলিয়া ইউরোপীয় দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলি পড়ে ফেলেন। যে বয়সে অনেকে দর্শন কি সেটিই জানে না, সেখানে সে বয়সে আলিয়া দর্শনের নামকরা বইগুলো পড়েছেন। ব্রাগসনের *Creative Evolution*, কান্টের *Critique of Pure Reason* এবং স্পেংলারের *Decline of the West* বইগুলো তার মননশীলতায় গভীর রেখাপাত করে। প্রথমদিকে তিনি যদিও হেগেলের অনুরাগী ছিলেন না, পরে অবশ্য তিনি হেগেলের লেখাও পড়েছেন। আলিয়া যখন তার হাইস্কুলের পড়াশোনার শেষের দিকে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন

মাঝামাঝি পর্যায়ে। খাদ্যসামগ্রীর স্বাভাবিক বাজারজাতকরণ ব্যাহত হওয়ায় ঠিকমতো বাজার করা যেত না। ফলে খাদ্যাভাবে মাঝে মাঝে না খেয়েও থাকতে হতো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চরম ডামাডোলের মধ্যে আলিয়া ১৯৪৩ সালে হাইস্কুলের পর্ব শেষ করেন। হাইস্কুল শেষ করার পর হাইস্কুলের সার্টিফিকেট দিয়ে ভাগ্যক্রমে একটি চাকরি পেয়ে গেলেন। কিশোর বেলায় চাকরিটি তার জন্য ছিল আশীর্বাদস্বরূপ।

কিশোর আলিয়া ইজেতবেগভিচ

এরই মধ্যে তিনি গ্রেফতার হলেন এবং তিন বছর কারাভোগ করলেন। ছোটোবেলা থেকেই আলিয়ার পছন্দের বিষয় ছিল আইন। স্বপ্ন দেখতেন আইনজীবী হওয়ার। দীর্ঘ কারাভোগ শেষে ১৯৪৯ সালে যখন তিনি মুক্ত হলেন, সিদ্ধান্ত নিলেন আইন পড়বেন। আলিয়ার মামা মিস্টার শুকরিয়া তখন নামকরা আইনজীবী। তিনি আলিয়াকে আইনে ভর্তি হতে নিরুৎসাহিত করলেন। আলিয়ার বাবাও বললেন—‘দেখো, একজন কারাভোগ করা ব্যক্তি হিসেবে তুমি আইন পেশায় ভালো করতে পারবে না। কমিউনিস্ট কর্তৃপক্ষ এখনও ভুলে যায়নি যে, তুমি কারাভোগ করেছ, তারা তোমাকে ক্ষমাও করেনি এখনও।’ কৃষিবিজ্ঞানে ভর্তি হলেন আলিয়া। তিন বছরে ১৩টি কোর্স সফলভাবে পাশও করলেন। কৃষিবিদ্যায় তিনি যথেষ্ট বিচক্ষণ শিক্ষার্থী ছিলেন। যত বছর গড়ায়, সেমিস্টার পার হয়; তিনি কৃষিশিক্ষার প্রতি আগ্রহ হারাতে থাকেন। স্বপ্ন যার আইন পড়ে বড়ো আইনজীবী হওয়া, কৃষিশিক্ষা তার কী করে ভালো লাগবে? অবশেষে তিনি কৃষিবিদ্যা থেকে বলকানের অন্যতম নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজধানীতে অবস্থিত ‘ইউনিভার্সিটি অব সারায়েভো’-

তে ১৯৫৪ সালে স্বপ্নের আইন অনুষদে বদলি হলেন। এবারের বিষয় তার মনঃপূত হলো, মনোযোগ দিয়ে পড়তে লাগলেন। বিগত তিন বছরের পড়াশোনার ব্যাপারে আলিয়া বলেছেন—'আমার মনে হয়নি তিন বছর কৃষিবিদ্যা পড়া আমার বিফলে গেছে; বরং আমি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিখতে পেরেছি। যেমন : গণিত, ভূমিবিদ্যা এবং চার প্রকারের রসায়ন তথা Organic, Inorganic, Analytical এবং Agricultural Chemistry পড়েছি।' দুই বছরের মাথায় ১৯৫৬ সালের নভেম্বর মাসে আইনবিদ্যায় স্নাতক ডিগ্রি লাভের মাধ্যমে আলিয়া তার দীর্ঘ লালিত স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেন।

কমিউনিস্ট প্রচারণা ও আলিয়া

আলিয়া তখন ১৫ বছরের কিশোর। বাবা-মায়ের কঠোর শাসনের নিগড় থেকে মুক্ত হয়ে তখন তিনি অনেকটাই মুক্ত বিহঙ্গের মতো নিজের মতো করে জীবন পরিচালনা করেন। সহপাঠী বন্ধুদের সাথে জীবন-জগতের চারপাশের সমস্ত চিন্তা ভাগাভাগি করেন। ছোটোবেলা থেকেই পড়ু য়া ছিলেন তিনি। বন্ধুদের সাথে সমাজতান্ত্রিক ও নাস্তিক লেখকদের বইপত্রও পড়েন। যুগোস্লাভিয়ায় তখন অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় শাসন, কিন্তু সমাজ-রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গনের মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও কমিউনিজমের চর্চা হয় বিপুলভাবে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে তিনি যে হাইস্কুলে পড়তেন, সেখানকার শিক্ষকদের মধ্যে কমিউনিজমের চর্চা ছিল প্রবল। এমনকি আশেপাশের অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তুলনায় তার স্কুলেই সমাজতন্ত্রীদের প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি। শিক্ষকরা নানাভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কমিউনিজমের নাস্তিক্যবাদী আদর্শের বীজ বুনে দেওয়ার চেষ্টা করত। তদুপরি পোস্টার, হ্যান্ডবিল, লিফলেট হাতে হাতে বিতরণের মাধমে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ প্রসারের চেষ্টা করা হচ্ছিল গোটা যুগোস্লাভিয়াজুড়ে। মূলত তৎকালীন যুগোস্লাভিয়ায় কমিউনিজমের এ উত্থান ছিল ইউরোপজুড়ে ফ্যাসিবাদের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ।

কমিউনিস্টরা গণতন্ত্রের ধার ধারে না, সেদিক থেকে এটি ফ্যাসিবাদ থেকে খুব একটা আলাদা নয়। বলা যায় একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। আলিয়ার ভাষায়— লাল স্বৈরাচারের উদ্ভব হলো কালো স্বৈরাচারকে প্রতিহত করতে। অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় একচ্ছত্র শাসনের অধীনে ভিন্ন আদর্শের প্রচার-প্রচারণা ছিল দণ্ডনীয় অপরাধ। সে কারণে কমিউনিস্ট প্রচারণা চলত অত্যন্ত গোপনে। তারা প্রশাসনকে ফাঁকি দিয়ে গোপনে দেশের বিভিন্ন স্থানে তাদের প্রচারপত্র বিলি করত। আলিয়ার ক্লাসরুমে বিতরণকালে তার হাতেও এ রকম কিছু লিফলেট-হ্যান্ডবিল পৌঁছায়। সমাজতান্ত্রিক লেখাজোখা পড়ে তিনি উপলব্ধি করলেন, সমাজতন্ত্র মূলত সামাজিক অসাম্যের জন্য সৃষ্টিকর্তাকে দায়ী করেছে, ধর্মকে দোষারোপ করেছে। যদি কেউ ধর্মকর্ম মেনে চলে, তাহলে সে সফল মানুষ হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না—এটিই হলো সমাজতন্ত্রের দাবি।

কমিউনিস্টদের বইপত্র পড়ে এবং শিক্ষকদের নানা রকম কথায় আলিয়া বিশ্বাসের দোলাচলে ভুগতে থাকেন। এক-দুই বছর তিনি তার বিশ্বাসের জগতে অনেকটা দ্বিধান্বিত অবস্থায় ছিলেন। তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারছিলেন না, আসলে কোনটা সঠিক ও গ্রহণযোগ্য; ইসলাম নাকি কমিউনিজম। কিন্তু যিনি পরবর্তী সময়ে বসনীয় মুসলিমদের জাতিসত্তা ও ধর্মীয় পরিচিতি রক্ষার

নিশানবরদার হবেন, তিনি কি করে ইসলামের সুমহান আদর্শের পরিবর্তে সমাজতন্ত্রের মরীচিকাময় ভঙ্গুর আদর্শ গ্রহণ করতে পারেন? শত জল্পনা-কল্পনা ও দীর্ঘ দোদুল্যমানতা শেষে তিনি ইসলামের চিরন্তন, ন্যায়ভিত্তিক সত্য আদর্শকেই বুকে ধারণ করেছেন এবং আমরণ সে আদর্শকেই সযত্নে লালন করেছেন। আলিয়া বলেছেন—'আমি সেটা (কমিউনিজমের যুক্তি) মেনে নিইনি। আমার কাছে মনে হয়েছে, ধর্মের মূল দাবি হচ্ছে জবাবদিহিতা। এ জবাবদিহিতা সকলের জন্য সমান, হোক সে রাজা বা সম্রাট; তাকেও জবাবদিহিতার কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। এমনকি দুনিয়ার জীবনে যদি কারও পুলিশের ভয় না থাকে, কেউ যদি পুলিশকে যেকোনোভাবে কবজা করে ফেলতে পারে, ধর্ম বলেছে তাকেও পরকালে তার যেকোনো অন্যায়-অপরাধের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহ ছাড়া এ নিখিল বিশ্ব আমার কাছে অর্থহীন এক পৃথিবী।'[২]

ইসলামকে যখন তিনি নতুন করে আঁকড়ে ধরলেন, তখন তিনি যেন নবজীবন লাভ করলেন। বিশ্বাসের দোলাচল ভেঙে চুরমার করে এক ভিন্ন আলিয়ায় পরিণত হলেন তিনি। কমিউনিজমের মিথ্যা ফানুস আর কমিউনিস্টদের বস্তাপচা যুক্তির বাণ তাকে বিদ্ধ করতে পারেনি। ইসলাম আর কমিউনিজমের দোলাচলে দুলতে থাকা আলিয়া যখন ইসলামকেই হৃদয়ে স্থায়ী আসন দিলেন, ইসলামের প্রতি তার দৃঢ়তা যেন আগের চেয়ে বহুগুণে বৃদ্ধি পেল। যে ইসলাম তিনি জন্মসূত্রে পেয়েছিলেন, যে ধর্মবিশ্বাস তিনি মক্তবে শিখেছিলেন, আলিয়ার ধারণকৃত নতুন ইসলাম যেন তার চেয়ে সহস্রগুণ শক্তিশালী। আলিয়া বলেছেন—'তারপর কখনো আর আমি সে বিশ্বাস হারাইনি।'[৩]

---

২ প্রাগুক্ত

৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪